OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 384 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 384 - 393
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

উত্তরবঙ্গের প্রচারবিমুখ সাহিত্যসাধক অমিয়ভূষণ মজুমদার

ড. জয়ন্ত মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, আড়ষা কলেজ
Email ID : jayantamandal24@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024
Selection Date 20. 07. 2024

Keyword
Amiyabhushan, North Bengal, political backlash, novels, Gar Shrikhand, Nayantara, Dukhiyar Kuthi, Udvastu, Nirvas, Madhu Sadhukhan.

Abstract
In order to discuss about Amiyabhushan Majumdar Mahashay, the renowned literary saint of North Bengal, it is necessary to know the contemporary country-time situation of his appearance. Because, the unstable situation of that time can be seen reflected in his artistic spirit and mind. After the establishment of British rule in India, Bengal became the main center of trade. Again the most powerful weapon of this Bangladesh was Hindu and Muslim unity. Strengthening the structure of British rule in Bangladesh required weakening Hindu-Muslim unity. From the beginning of the 20th century, the discontent of the common people of Bengal over the application policy of the Indian National Congress began to manifest itself. The British government tried to exploit this discontent of the common people. Lord Curzon tried to break up Bangladesh in 1905 on the inconvenient pretext of establishing British rule in the vast province. Till now the Bengalis were moving outside the political climate, but after the proposal of partition of Bengal, a volatile political environment was created in Bangladesh. A new consciousness was created between Hindus and Muslims through political backlash. Initially, communal sentiments developed between Hindus and Muslims, but soon they overthrew communalism in their efforts to unite, completely thwarting Curzon's Partition of Bengal policy. Going a little further along the pages of history, it can be seen that the First World War started in 1914. Bengalis of India and Bengal also got caught up in the British's trap. After the end of the First World War in 1918, the demand for autonomy came to the mind of Bengalis. Just as the common people who had become powerless after taking part in the First World War wandered in the dream state, the Bengali people began to stir again demanding autonomy. In such a turbulent situation, the great literary writer Amiyabhushan Majumdar appeared in the world.

Discussion

উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য সাহিত্য সাধক অমিয়ভূষণ মজুমদার মহাশয়কে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই তাঁর আবির্ভাবের সমসাময়িক দেশ-কালের পরিস্থিতি জানা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, সেই সময়ের অস্থিরময় পরিস্থিতি তাঁর শিল্প চেতনায় ও মননে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা হয়ে উঠল বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। আবার এই বঙ্গদেশের সব থেকে শক্তিশালী অস্ত্র ছিল হিন্দু ও মুসলিম ঐক্য। বঙ্গদেশের ব্রিটিশ শাসনের কাঠামোকে মজবুত করার জন্য প্রয়োজন ছিল হিন্দু ও মুসলিম ঐক্যকে দুর্বল করে দেওয়া। বিশ শতকের শুরু থেকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন নীতির উপর বাংলার সাধারণ মানুষের অসন্তোষ প্রকাশ পেতে থাকে। সাধারণ মানুষের এই অসন্তোষকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে ব্রিটিশ সরকার। বিশাল প্রদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার অসুবিধাজনক অজুহাত দেখিয়ে ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন লর্ড কার্জন। এতকাল পর্যন্ত বাঙালিরা রাজনৈতিক বাতাবরণের বাইরে চলাফেরা করছিল, কিন্তু বঙ্গ বিভাজনের প্রস্তাবের পরেই বঙ্গদেশে এক অস্থিরময় রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক প্রত্যাঘাতের মধ্যদিয়ে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সৃষ্টি হল এক নতুন চেতনা। প্রথম দিকে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি হলেও খুব শীঘ্রই নিজেদের ঐক্যবদ্ধের চেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতাকে সমূলে উপরে ফেলে কার্জনের বঙ্গ বিভাজন নীতিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেয়। ইতিহাসের পাতা ধরে আরও একটু এগিয়ে গেলে দেখা যায় যে, ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটিশদের কুচক্রে পড়ে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গের বাঙালিরাও তাতে জড়িয়ে পড়ে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে বাঙালিদের মনে স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবি চলে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শক্তিহীন হয়ে পড়া সাধারণ মানুষ যেমন স্বপ্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি আবার স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবিতে বঙ্গবাসীর মন আন্দোলিত হতে থাকে। এই রকম এক অস্থিরময় পরিস্থিতিতে মহান সাহিত্য স্রষ্টা অমিয়ভূষণ মজুমদার পার্থিব জগতে আবির্ভূত হলেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের জন্ম হয় ১৯১৮ সালে ২২শে মার্চ (৮ই চৈত্র, ১৩২৪) কোচবিহারে মাতুলালয়ে। পিতা অনন্তভূষণ মজুমদার, মাতা জ্যোতিরিন্দু দেবী। অমিয়ভূষণ মজুমদারের পিতৃ নিবাস পাবনা জেলার সারা থানার অন্তর্গত পাকুড়িয়া গ্রামে। অমিয়ভূষণ মজুমদার 'নিজের কথা' গ্রন্থে নিজের জন্ম সম্পর্কে বলেছেন -

> "জন্ম ২২ মার্চ (৮ চৈত্র ১৩২৪) বাংলা মতে শুক্রবার, আর ইংরেজিতে শনি, বোধহয় ভোররাতে নতুন দিন হওয়ার আগে বলেই এই দ্বিধা। স্থান মামাবাড়ি, দেশীয় রাজ্যের রাজধানী কোচবিহার শহরে। পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। পিতৃভবন উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার পদ্মাপারের গ্রাম পাকুড়িয়া, হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে।"[১]

সেই সময়কার বাংলাদেশে রেওয়াজ ছিল গর্ভবতী মেয়েরা তাদের সন্তান প্রসবের সময়ে পিত্রালয়ে যাওয়ার। সেই হিসেবে মাতা জ্যোতিরিন্দু দেবীও অমিয়ভূষণ মজুমদারের জন্মের আগে পিত্রালয়ে এসেছিলেন। অমিয়ভূষণ মজুমদারের শৈশব পাবনাতেই কেটেছিল। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিও হয়েছিলেন। বঙ্গদেশের রাজনীতি যে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে সেই বিষয়টা অমিয়ভূষণ মজুমদারের পিতা অনন্তভূষণ মজুমদার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এর ফলে মাত্র ৯ বছর বয়সে মামা রমেশ নারায়ণ চৌধুরীর হাত ধরে কোচবিহারে চলে আসতে হয়েছিল অমিয়ভূষণ মজুমদারকে। সেই সময় গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে বিখ্যাত স্কুল কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল। এই জেনকিন্স স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই অমিয়ভূষণ মজুমদার কোচবিহার শহরকে আপন করে নিয়েছিলেন। এই শহর তাঁকে একেবারে অনাস্বাদিত এক আনন্দের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। শহরের আধুনিকতা, অনেক মানুষের এক বুক ভালোবাসা আর ইট কাঠের রূপের ফাঁদে প্রথম দিন থেকেই সেই যে জড়িয়ে পড়লেন, সারা জীবন তাতেই আকণ্ঠ মজে রইলেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদার ছিলেন মাটির খুব কাছাকাছির মানুষ। তিনি মনে করতেন মা দিয়ে শুরু যার মাটি তার নাম। মা ও মাটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসীম। শৈশব থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি যেমন মাটির খুব কাছাকাছি ছিলেন তেমনি মাটির উপর বসবাসকারী মানুষজনদেরও খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। জমিদার পরিবারে জন্ম হলেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে অমিয়ভূষণের শৈশব কাটেনি। খুব অল্প বয়স থেকে বাবা ও মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোচবিহারে চলে আসার ফলে

সেখানকার মানুষজন থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, নদনদী, পশুপাখি, বনজঙ্গল সমস্ত কিছুকেই আপন করে নিয়েছিলেন। কোচবিহার শহরে সেই সময় মনকে ভুলিয়ে দেওয়ার মত কিছু না থাকলেও মনকে উদার করার মত আধুনিকতার কোনও অভাব ছিল না। শৈশবে দেখা পাকুড়িয়ার মস্তবড় নিজেদের নীলকুঠি কোচবিহারে ছিল না, কিন্তু কোচবিহারে যা ছিল তা পাকুড়িয়ার নীলকুঠির থেকে অনেক বেশি উদার ও অনেক বেশি মনোরম।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের পিতৃনিবাস ছিল পাবনা জেলার পাকুড়িয়া গ্রামে যা হার্ডিঞ্জ ব্রীজ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। পায়ে হেঁটেও যাওয়া যেত, কিন্তু মজুমদার পরিবারের লোকেরা সাধারণত পাল্কীতে করে যাতায়াত করতেন। ১৯১২ সালে হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় বঙ্গভঙ্গ রোধ করা গেলেও বিশের দশক থেকে আবার হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরতে থাকে। এই সময়কার হিংস্রতা অমিয়ভূষণের মনে স্থায়ীভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময় ঠনঠনের কালীবাড়ি শুধু নয়, ঢাকাতেও দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। সেই দাঙ্গা যাতে নিজেদের গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য বাবা অনন্তভূষণ মজুমদার বন্দুক ও কয়েক বাক্স পিতলমোড়া বুলেট কিনে এনেছিলেন।

১৯২৯ সালে পাবনা থেকে বাবা, মা, পরিবারের সবাই কোচবিহারে চলে এসেছিলেন। এই সময় থেকে তাঁর বাবার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া চলতে থাকে। দিনের চার ঘণ্টা বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, ড্রয়িং। বাংলা ইতিহাস এবং ড্রয়িং-এ খুব বাজে নম্বর পেতেন। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়ই এমন একজন শিক্ষকের সান্নিধ্যে তিনি এলেন যিনি তাঁকে বাংলা শিখতে প্রচুর সাহায্য করেছেন। ইনি হলেন তৎকালীন জেনকিন্স স্কুলের ঊষাকুমার দাস। ছেলেবেলার লেখাপড়ার কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে মনের মণিকোঠায়। সাহিত্য প্রীতির সূচনা সেখান থেকেই। এমন একজন মাস্টারমশাই সেই সময় স্কুলে উপস্থিত হলেন যিনি ছাত্রদের কিশোর মনে বপন করে দিয়েছিলেন সাহিত্য-অনুরাগ।

কোচবিহার ছবির মত শহর। প্রায় আধুনিক এই শহরজীবন অমিয়ভূষণকে দুহাত প্রসারিত করে আপন করে নিয়েছিল। কোচবিহারের সব থেকে বড় দিঘি 'সাগর দিঘি' যা আয়তনেও বিশাল এবং সৌন্দর্যে অপরাজেয়। এটি প্রদক্ষিণ করে সান্ধ্যভ্রমণ আনন্দদায়ক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল। নাগরিক জীবনের রূপও ছিল সমান সুন্দর। প্রীতি ও বন্ধুতার বন্ধনই ছিল সবথেকে বড় বন্ধন। সামাজিকতা, জমিজমা বা জীবিকা অর্জন নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধের কোন কারণ ছিল না। কোন রকম নির্বাচন দ্বন্দ্ব ছিল না। আপদে বিপদে পরস্পর পরস্পরের নিকট অকুণ্ঠ সাহায্য পেত। পাকুড়িয়ার বাড়ির মত মামার বাড়িতে অবাক লাগার মত কিছুই না থাকলেও আধুনিক এক মুক্ত পরিবেশ ছিল যা তাঁকে ভাবীকালের মহান স্রষ্টা হওয়ার দ্বার খুলে দিয়েছিল। কোচ রাজাদের শাসনকালে সেখানকার ধর্ম, লোকসংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষার বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রভূত পরিমাণে উন্নতি সাধন সম্ভবপর হয়েছিল। মধ্যযুগে যখন বাংলাভাষাকে শিক্ষিতজনেরা উপেক্ষিত করেছিল ঠিক সেই সময়েই কোচবিহার রাজ রাজাদের উৎসাহে বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল। ১৮৮৮ সালে রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ১৮৮১ সালে নারী শিক্ষার বিকাশের জন্য সুনীতি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কোচ রাজাদের এই আধুনিক চিন্তাভাবনা অমিয়ভূষণকে সব থেকে বেশি আকর্ষণ করেছিল।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের পড়াশোনার খুব ঝোঁক ছিল। এর প্রধান কারণ অবশ্যই মামার বাড়ির প্রভাব। কেননা, অমিয়ভূষণের দাদু রামনারায়ণ চৌধুরী তৎকালীন কোচবিহারের বিখ্যাত আইনজীবি এবং একমাত্র মামা রমেশ নারায়ণ চৌধুরীও আইন ব্যবসা করতেন। আবার দিদিমা চাকরি না করলেও তিনিও ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। দিদিমার বাবা সেকালের মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক, আর তাঁর কাকা ছিলেন রামতনু লাহিড়ীর জামাতা। কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে দিদিমার ছিল নিত্য যোগাযোগ। শৈশবেই অমিয়ভূষণ প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরের কৌটা' আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়েছিলেন। শৈশবের সেইসব উচ্ছ্বাসময় দিন জীবনে বয়ে নিয়ে আসে দেশপ্রেমের অক্ষয় অনেক মুহূর্ত। জীবন তখন আর একার নয়, জীবনে জীবন যোগ করে হয়ে উঠতে চায় দেশের ও দশের। অমিয়ভূষণ কৈশোর বয়স থেকেই কেশব সেনের আশ্রম, ব্রাহ্মসভা এসবের প্রতি অন্তরে খুব শ্রদ্ধা রাখতেন। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীতে তখনই তিনি শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, ল্যাম প্রমুখ কবির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, 'কথা ও কাহিনী' শেক্সপিয়ারের 'রোমিও জুলিয়েট' 'ম্যাকবেথ' সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছিলেন। জীবনে প্রথম প্রেমের মতন প্রেমের কবিতার পাঠক হওয়াটা তাঁর জীবনে এক আশ্চর্য নরম অভিজ্ঞতা। বুকের মণিকোঠায় তার জায়গাটা চিরকাল অমলিন। স্কুলের পাঠক্রম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 384 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাঁর মনের মধ্যে সাহিত্যপ্রীতি সঞ্জাত করে দিয়েছিল। কৈশর বয়সেই সাহিত্য পাঠের মধ্যদিয়ে খুলে যায় সেই দরজা যা নরম দুবাহু মেলে এসে দাঁড়াল প্রথম প্রেমের কবিতা হয়ে। তাঁর কাছে প্রথম প্রেমের অনুভব আর প্রথম প্রেমের কবিতা পড়ার আনন্দে কোনও তফাৎ নেই। অমিয়ভূষণ মজুমদার বাল্যবয়স থেকেই পড়াশোনায় ভালোছিলেন। এই প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ নিজেই লিখেছেন –

> "আমি পড়ুয়া ছিলাম, ভালো ছাত্র ছিলাম না। প্রত্যেক ক্লাসে প্রাইজ পেয়ে ওঠা যেমন অনায়াস ছিলো, সব বিষয় মিলিয়ে প্রথম দ্বিতীয় হওয়া ঘটে উঠত না। কয়েকটা লেটার মার্কস নিয়ে First Division এ পাশ করা আদৌ চিন্তার ছিল না, কিন্তু তার বেশি কিছু করা হয়ে উঠতো না। বাবার কাছে বসে পড়া, পরীক্ষার পক্ষে কোনটা Important তা তিনি জানতেন না, যে-কোন বিষয় আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পড়া আমাদের প্রথা ছিলো। যা শিখতুম তার অধিকাংশই পরীক্ষায় লাগতো না। এই ভাবে কোচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুল থেকে ম্যাট্রিক আর কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.এ পাস করার পর ভাবনার বিষয় দেখা দিলো। বাবা লেখাপড়ার ব্যাপারে important ইত্যাদি ভাবতে আরম্ভ করলেন। ...বাবার ইচ্ছা ছিলো ইংরেজি পড়ি এবং তখন তার ইচ্ছা হয়েছিল পরীক্ষায় বিশেষ ভালো ফল করি, কারণ বিশেষ ভালো ফল না হলে বিশেষ ভালো চাকরি হয় না। ... সেই অনার্স, যার বিষয় নাকি ইংরেজি সাহিত্য নামক সমুদ্র, বালতি ডোবাতে শুরু করলাম।"[২]

বাস্তবতা মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়। অমিয়ভূষণ মজুমদারও অনেক কিছু বুঝতে শিখেছিলেন কলেজ পাশ করার আগেই। স্মৃতিচারণায় তিনি লিখেছেন –

> "বি.এ. পড়া শেষ হওয়ার আগেই এই পৃথিবীকে বেশ চিনতে পারার চেষ্টা করছিলাম। পরে একটা কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছিলাম। বি.এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে না বেরোতেই ডাকঘর থেকে ডাক এসে গেল। আদৌ বেকার হতে হলো না। বি.এ পরীক্ষায় লেখাপড়া শেষ করে চাকরি। চাকরি করার এক বছর হতে না হতে বিয়ে। আমাকে বেকার হতে হয়নি। বাইশে পৌঁছে ষোড়শী স্ত্রী পেয়ে স্ত্রীলোকের অভাব বোধ করতে হয়নি। মনস্তাত্ত্বিকরা বলতে পারেন, হয়তো এইজন্য আমার কবিতা লেখা হয়নি, এবং এই জন্যই প্রেমের গল্প লিখতে পারিনি। এই চাকরির ব্যাপারে একটা কথা বলা দরকার। খুব সামান্য চাকরি, পোস্টঅফিসের কেরানির, কিন্তু চাকরিতে পৌঁছে দিতে রাজশাহী জেলার সেই গ্রামে আমার মামা গিয়েছিলেন। এটা বলা দরকার অ্যাডভোকেট হিসাবে তখন তার আয় আমার বেতনের চল্লিশ গুন হবেই। এটা একটা প্রমাণ আমার মামার ভালোবাসা ও তৎকালীন আমাদের পারিবারিক আদর্শের। মামা যেন এই ঘোষণা করেছিলেন আর্থিক সঙ্গতি দিয়ে মানুষের বিচার হয় না, চাকরিটা করবে বটে, কিন্তু মানুষ হিসাবে তোমার দাম কমছে না। তো, মামা সেই গ্রামের রাজামশাইকে ডাকাডাকি করে প্রাসাদের বাইরে এনে নিজের পরিচয় দিতেই আমরা সেই মার্বেল মেঝের রাজপ্রাসাদে অতিথি হলাম, রাজার কাছারিতে বসানো ডাকঘরে কাজ করতে শুরু করলাম। কিন্তু মামা যেতেই, আমি তো রাজ অতিথি থাকতে পারি না, তবে রাজার আদেশে তার এক কর্মচারীর অতিথি হলাম। আর সেই তখনই প্রথম সূত্রপাত সেই অন্ধকার আর নিঃসঙ্গতার, যা আমাকে অনেকদিন ঘিরে ছিলো। আকাশের পাখি ঘেরাটোপের খাঁচায়।"[৩]

অমিয়ভূষণ মজুমদার চাকরির সূত্রে রাজশাহীতে চলে গেলে প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এদিকে আবার কোচবিহারে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে অনন্তভূষণ মজুমদারের পক্ষে। এর ফলে তিনি আবার সপরিবারে পাবনাতেই ফিরে গেলেন। জীবনযুদ্ধে রসদ জোগাতেই তিনি এই চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাবা পাবনাতে চলে যাওয়াতে বাবার কাছিকাছি থাকবার জন্য তিনি বদলি হয়ে পাবনার কাছাকাছি পাকশিতে চলে আসেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 384 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোচবিহার শহর থেকে দূরে চলে যাওয়ায় তিনি সুখী হতে পারেন নি। যৌবনের শুরুতে সেই অপরিশুদ্ধ নোংরা কলঙ্কিত পরিবেশে চাকরি করার হতাশা তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। চাকরির গোঁড়ায় তিনি রাজশাহী আর পাবনা জেলায় ঘুরতেন। রবীন্দ্রনাথের সাজাদপুর আর নিজেদের গাঁয়ের রেলস্টেশন পাকশির রেল কলোনিতে বেশিরভাগ সময় কেটেছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর মধ্যে জল্পনা কল্পনার ভাব জমতে শুরু করেছিল কিন্তু বদলি হয়ে পাকশিতে চলে যাওয়ার ফলে সেই ভাবনা থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন তিনি। কেননা, নতুন পরিবেশকে উপলব্ধি করতে আবার কিছুদিন লেগে যাবে। বাবা মায়ের প্রতি তাঁর যেমন শ্রদ্ধা ছিল তেমনি ছিল নিজের স্ত্রীর প্রতিও ভালোবাসা। তবে তিনি যখন যে পরিবেশে থেকেছেন তখন সেই পরিবেশেই স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে ওঠা বসার সুযোগ ছাড়েননি।

কোচবিহার শহরের আধুনিকতা ছেড়ে পাকশির সেই এক ঘেয়েমি জীবন যাপনের ফলে অমিয়ভূষণ অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। নৈরাশ্য ও নিঃসঙ্গতায় তাঁর জীবন কাটতে থাকে। এই নিঃসঙ্গতা ও নৈরাশ্যময় জীবন থেকে মুক্তি পেতেই তিনি হাতে তুলে নেন কাগজ ও কলম। পার্থিব জগতের এই যন্ত্রণা থেকে একমাত্র শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যই পারে মানুষকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিতে। এই জগতে এসেই মানুষের অব্যক্ত ভাবনা তার ভাষা খুঁজে পায়, মুক্তি লাভ করে এবং প্রসারিত হয়। নিজের স্বাধীন চিন্তা ভাবনাকে নিজের মত করে প্রকাশ করতে পারে। এই পৃথিবীতে বাস করে এর অনুতে এবং সমগ্রতায় অনেক কিছু শিল্পী এবং সাহিত্যিকরা দেখে থাকেন যা অন্য সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না। সমগ্র চরাচরকে ভূর্জপত্রে অথবা কাগজের পিঠে স্থাপন করা অসম্ভব, কলাকৌশল করে তারই ভ্রমোৎপাদন করে থাকেন। সাহিত্যই মানুষকে মুক্তির পথ খুঁজে দেয়। অমিয়ভূষণ মনে করেন মানুষ হয়ে কেউ জন্মাতে চায় না। জন্মের মুহূর্তে যে প্রচণ্ড চিৎকারে জেগে উঠে সেটাই তার প্রতিবাদ। মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা মানেই পৃথিবীর চূড়ান্ত সুখ ও চূড়ান্ত শান্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া। একারণেই এক শ্রেণীর মানুষ শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ান। অমিয়ভূষণ মজুমদারও এর ব্যতিক্রম শিল্পী সাহিত্যিক নন। পাকশিতে পরিবারের সকলেই তাঁর কাছাকাছি থাকলেও তিনি সুখী ছিলেন না। কেন তিনি সুখী হতে পারেননি এবং ডাক বিভাগে চাকরি করার সাথে সাথে তিনি কি করে লেখার জগতে এলেন সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন -

> "এসব সত্ত্বেও আমি সুখী হতে পারছিলাম না। কোচবিহারের কম্পিটিশনহীন লেখাপড়ার পৃথিবীর বাইরে একা তো ছিলামই, উপরন্তু আলোর বদলে, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার বদলে, এ কী কালো আর নিদাঘ কঠোরতা! এখানে কম্পিটিশনই সার কথা, এখানে টাকা দিয়ে মানুষ মাপা হয়, চাকরি বড়ো হলে টাকা বেশি, সুতরাং সে বড়ো এবং বেশি মানুষ। ফলে তখনকার মনের সেই নিঃসঙ্গতার পাশে পাশে একটা দারুন চাপ পড়েছিল, তাকে এক রকমের inferiority complex বলে বোধ হয়। নিজের অভাববোধ নেই, চারিদিকের অভাববোধ উত্তাল ঢেউ হয়ে গ্রাস করতে চায়। এই রকম অবস্থায় ইতিপূর্বেই কাগজকলম নিয়ে সন্ধ্যার দিকে বসার অভ্যাস হচ্ছিল। লেখা আত্মস্থ হওয়ার স্বাদ দেয়, একটা ভরশূন্য অবস্থায় অন্য রকমের আলোয় চোখ মেলা যায়, আমার সেই কোচবিহারের আমিত্বে থাকা যায়।"[৪]

কোচবিহার শহর ছেড়ে পাকশির ডাক বিভাগে চাকরি করতে গিয়ে অমিয়ভূষণের জীবন অল্পদিনের মধ্যে হাফিয়ে উঠে। জেলখানার জীবন যাপনে যেন আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। পাকশির নতুন পরিবেশে যুক্ত হয়ে তিনি যা পেলেন কোচবিহারের অতিবাহিত জীবনের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য ছিল না। এর ফলে নিজেকে বাঁচানোর একটা তীব্র তাগিদ কাজ করেছিল তাঁর মনের মধ্যে। মানুষের জীবনে হতাশা নানা কারণে আসতে পারে। অমিয়ভূষণের জীবনে যে হতাশা এসেছিল তারই কারণ খুঁজতেই তিনি হতাশার মধ্যদিয়ে লেখালেখি শুরু করেছিলেন। কোন কোন লেখক বলেন, না লিখে উপায় থাকে না বলেই লিখতে হয় অর্থাৎ কেউ যেন লেখককে পেয়ে বসেন এবং সেই লিখতে বাধ্য করান। আবার কারো কারো মতে অন্তরে প্রয়োজনের বেশি বাড়তি খানিকটা কিছু আছে বলেই সাহিত্য করা। অমিয়ভূষণ এসব কথাকে মেনে নিতে পারেননি। কেননা, পাঠক সমাজকে অতীন্দ্রিয়র সান্নিধ্যে এনে চমকিত করা যায় কিন্তু এমন কোন প্রেরণার উৎসে পাঠক

আজকাল আর বিশ্বাস রাখে না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের মধ্যে বাড়তি অবশ্যই কিছু থাকে। এই বাড়তি কিছু পথ বলে দেয় না, চলার শক্তি যোগায় বরং।

> "এ কথাটা সোজাসুজি বলে দেওয়া ভালো সাহিত্য করার পথটাকে আমরা সজ্ঞানে বাছাই করে নিয়ে থাকি। আর বাছাই করার ব্যাপারটা হয় পুরো মন দিয়ে। মনের চেতন বা অবচেতন অংশ কে কাকে কতটুকু সাহায্য করল এ ব্যাপারে তা বলতে যাওয়া বৃথা। সাহিত্যকে মন সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করছে, তখন বাড়ির কে কতটুকু সাহায্য করবে, আয়োজনে কি তাদের প্রস্তুতি সেটা নিয়ে বেশি আলোচনা করলে অতিথি বিড়ম্বিত বোধ করতে পারে।"[৫]

অমিয়ভূষণ মজুমদার কোন বিশেষ প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লিখতে শুরু করেননি এ কথা স্বীকার করা যেতেই পারে। তিনি সজ্ঞানে লেখার জগতে প্রবেশ করেছিলেন। যদিও এই লেখালেখির পিছনে সামান্য হলেও স্ত্রীর মূল্যবান প্রেরণা ছিল। কেননা, তিনি রাতে বসে যা কিছু লিখতেন সকালে উনুন ধরাতে গিয়ে সেই সকল লেখাগুলো পড়ে দেখতেন। স্ত্রীর সেই প্রেরণার কথায় অমিয়ভূষণ মজুমদার লিখেছেন -

> "একদিন স্ত্রী বললেন টুকিটাকি কি লেখ, উনুন ধরাতে গিয়ে দেখি, একটা গল্প লেখ না। খেলার মতো মন নিয়ে ছুটির দিন পর গল্প লিখলাম। হঠাৎ কি করে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পত্রিকা পূর্বাশার একটি কপি বাড়িতে এসেছিল। গল্পটা শেষ করে পরের দিন সকালে গল্পটা সঞ্জয় বাবুর নামে পাঠিয়ে দিলাম। ঠিক পনেরোদিন পরে এক কপি পূর্বাশা এল। দেখি, আশ্চর্য আমার সেই গল্প প্রায় দশ পনেরো পৃষ্ঠা জুড়ে। এই শুরু; কিন্তু শুরুটা ভালো হল।"[৬]

অমিয়ভূষণ মজুমদার স্কুল জীবন থেকেই ছবি আঁকার প্রতি বিশেষ মনযোগী ছিলেন। আবার স্কুল জীবন থেকেই ইংরেজি সাহিত্যে যতটা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে ততোটা জ্ঞান অর্জন করত পারেননি। কেন না সেই সময় তার বাবার তত্ত্বাবধানে যখন পড়াশোনা করতেন তখন বাংলা সাহিত্যের ওপর সব থেকে কম সময় ধার্য করা থাকতো। আবার ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে বাংলা সাহিত্য থেকে অনেক দূরে সরে যান। বুড়ো বয়সের আগে তিনি বাংলা সাহিত্য নিয়ে গভীর ভাবে ভাববার সময় পাননি। আবার যে সময়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের কথা ভাবতে শুরু করলেন সেই সময় পাঠকের মনমতো কিছু লেখাও খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে সেই যে শুরু করেছিলেন, মাঝে আর কোথাও তাঁকে থেমে যেতে হয়নি। পাঠকের চাহিদার কথা ভেবে তিনি লিখতে পারেননি, লিখতেন নিজের ভালো লাগার তাগিদে।

> "আমি যে উপন্যাস লিখতে চাই তা এখনও লেখা হয়নি। অর্থাৎ আমি যাকে উপন্যাস বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হব না, তেমন উপন্যাস লেখার চেষ্টা করে থাকি। হয়তো তা কোন দিনই লেখা হবে না, লেখা হলেও ছাপা হবে না, কিন্তু সেগুলি আমার জাগ্রত ও নিদ্রার আনন্দ। এই আনন্দ ছাড়া আমার চলে না, এমন নেশা ধরেছে।"[৭]

পূর্বাশা পত্রিকায় অমিয়ভূষণের ছোটগল্প বের হওয়ার পর থেকেই লেখালেখির দিকে একটু বেশি করে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর কাছে লেখালেখি যখন বেশ সুখের তখন আরও একটু বেশি লিখলেও ক্ষতি নেই। ধীরে ধীরে তাঁর লেখার পরিমাণ সম্পাদকদের চাহিদার তুলনায় বেশি হতে লাগল। এই লেখালেখির সুবাদে লেখক ও সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কবি বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, অনিলা চক্রবর্তী, আবু সৈয়দ আইয়ুবের সঙ্গে অমিয়ভূষণের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এর ফলে এই সকল মান্যগণ্য ব্যক্তিদের আশীর্বাদ ও উৎসাহ পেয়েছিলেন তিনি। সেই থেকে লেখার নেশায় মগ্ন হলেন অমিয়ভূষণ। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে নয়, বরং লিখতেই তাঁর ভালো লাগতো। কেননা, তাঁর কাছে লেখাটা খুব সুখের। অমিয়ভূষণের লেখালেখির জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হত - জায়গা, মানে পঞ্চমুন্ডির আসন অর্থাৎ তাঁর ভাঙা চেয়ারটা। যখন তাঁর পায়ে রোদ্দুর এসে পড়ত তখন তাঁর মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে উঠে। তখন তাঁর প্রয়োজন হত কাগজ আর কলমের।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 384 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার কোথাও তিনি বলেছেন, তাঁর লেখার ইচ্ছাটা এসেছিল নিজেকে বাঁচিয়ে কলেজি আবহাওয়ায় মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু লেখা যে তাঁর 'First Love' হয়ে উঠবে এমনটা কখনো ভাবেননি। এখন তিনি লেখেন নিজের সুখের জন্য। লেখা যে কেমন intense delight তা অন্য কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়। তাঁর লেখার পিছনে সব সময় থাকে intensive delight। লেখার মধ্যে যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ ছাড়া জীবন যেন অর্থহীন। সাহিত্যিকের আদর্শ সম্পর্কে অমিয়ভূষণের বোধ অত্যন্ত পরিষ্কার। সাহিত্যিক সমাজ সম্বন্ধে ভালোমন্দ নিশ্চয়ই ভাবেন, অন্যের চাইতে মানুষকে বেশি ভালোবাসেন বলে মানুষ লেখকের অনুভূতিতে প্রোথিত থাকে। কলকাতার সাহিত্যের বাজারে যখন অমিয়ভূষণের নাম ছড়িয়ে গেল তখন তিনি অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে নিজেকেও জড়িয়ে ফেললেন।

মাটি, জল ও আকাশের মধ্যে যে ব্যবধান, যে অন্তরীক্ষ তা সৌন্দর্যে ঠাসা, ভরাট। কিন্তু ছবির যেমন ফ্রেম, এই সৌন্দর্যকে তেমন নিজের মন বুদ্ধি চেতনা দিয়ে কেটে নিতে থাকলে তবে রূপ ধরা দেয়, এরকম একটা চিন্তা দেখা দিয়েছিল তাঁর মনে। ফলে বেতনের লেখা থেকে অমিয়ভূষণ সরে এসে ছোট বড় নানা ফ্রেমের মধ্যে সেই সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে নিয়ে দেখার নেশা লাগাতেন। তাঁর নেশাটা সব সময়েই এস্কেপ। নিশ্চয়ই এস্কেপ করার এক অজ্ঞাত প্রয়াস ছিল। তাঁর মতে যাদের কখনও এস্কেপ করতে হয় না, তারা বালিশে মাথা রাখলেই স্বপ্নহীন ঘুমে ডুবে যায়। তাঁর মতে মনের মধ্যে একজন বনেচর নড়তে চড়তে শুরু করে কিন্তু বোঝা যায় না। হঠাৎ কোন এক সময়ে যদি সেই বনচরের মুখোমুখি হলে বেশ ধোঁকা লেগে যায়। মনে এমনি সন্দেহ হয় যেন সেই আসল মানুষটা যে ভিড়ে আত্মগোপন করতে অভ্যস্ত বলে কদাচিৎ সামনে আসে। এই প্রসঙ্গেই অমিয়ভূষণ মজুমদার আবার লিখেছেন -

> "আমার জীবন সমতলের হাঁটুজলের নদী। পার আছে, পারে ঘরবাড়ি, ধানের আর তিলের ক্ষেত, মেয়েরা জল নিতে আসে, রাতে গুলবাঘাও হয়তো, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত আছে, কিন্তু নিতান্ত সাধারণ, ভুলে যাওয়ার মতো ঢেউ ওঠে না, মধুকর ডোবে না, জলদস্যুদের বছর চলে না।"[৮]

অমিয়ভূষণ মজুমদার যে সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করতেন তখনকার সময়ে দুই ধরনের পত্রিকার প্রচলন ছিল। একদিকে ছিল লিটল ম্যাগাজিন এবং অপর দিকে ছিল ব্যবসায়ী পত্রিকা। এই লিটল ম্যাগাজিন সাধারণত চিন্তাশীল লোকেরাই চালাতেন। এই পত্রিকা লাভ ক্ষতির হিসেব রেখে নয় বরং একজন নবীন লেখককে শান দিয়ে কীভাবে আরও চকচকে করা যায় তার দিকে নজর দিত। এই লিটল ম্যাগাজিনের বাজার যেমন খুব জমে উঠতে পারত না, তেমনি আবার ক্রেতার চাহিদাও খুব বেশি থাকত না। এই প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ লিখেছেন -

> "যখন আমরা ব্যবসাদার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাসীনদের কথা মাথায় রেখে 'লেখালেখির' চাইতে বেশি কিছু করতে চাই, ব্যক্তিগত নান্দনিক আবেগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হই, নিজের হয়ে সাহিত্য ব্যাপারে নিজের পথে চলতে চাই, তখন ব্যবসাদারেরা অথবা রাজনৈতিক নেতারা আমাদের সাহায্য করতে পারে না। করবেই বা কেন? যার বাজার তৈরি হয়নি, যার জন্য ক্রেতার চাহিদা নেই, তা কি কোন ব্যবসাদার স্টক করে?"[৯]

অমিয়ভূষণ মজুমদার ও কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতের অমিল ঘটায় তাঁদের বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরে যায়। এদিকে আবার পূর্বাশা বা চতুরঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক অমিয়ভূষণের লেখা ছাপতে আগ্রহ প্রকাশ না করায় অমিয়ভূষণ মজুমদার বামপন্থী পত্রিকায় লেখা পাঠাতে শুরু করেন। একদা 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। আবার সেই পরিচয় পত্রিকার কর্তৃপক্ষের আগ্রহেই বামপন্থী পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়। পূর্বাশা পত্রিকাতে যেমন লেখকের স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনায় কেউ হস্তক্ষেপ করত না, সেই রকম বামপন্থী পত্রিকায় যুক্ত থাকার পিছনে একই যুক্তি ছিল তাঁর। সে যাই হোক, লেখালেখির জগতে প্রবেশ করার পর থেকে তাঁকে কখনও হতাশায় ডুবে যেতে হয়নি। সব সময় কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় পেয়েই যেতেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছেন -

> "প্রথমত আমি নিরাশ্রয় ছিলাম না। এরকম অবস্থা আমার কখনই হয়নি যে, লেখা জমে যাচ্ছে আর তা পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে না। তখনও এবং এখনও, লেখা না চাইলে লিখি না, জমে কি করে লেখা! দ্বিতীয়ত, বামপন্থী পত্রিকার কিংবা তার রাজনীতির সঙ্গে কখনই আমার এমন সম্বন্ধ ছিল না যে, তাদের কাছে না গেলে আমি উদ্বাস্তু। তাদের সঙ্গে আমার এমন সম্বন্ধ ছিল না যে, তারা আমার প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় এবং আমি বেকার যুবক যে তাদের আশ্রয়ে থেকে চাকরি খুঁজছি। এরকম ক্ষেত্রে বেকার যুবকেরা এবং উদ্বাস্তু দুঃস্থ আত্মীয়রা যেরকম কর্তা এবং কর্ত্রীর উপরে নির্ভরশীল এবং বশংবদ হয়, আমি কখনই ছিলাম না।"[১০]

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর 'গড় শ্রীখণ্ড' এবং 'নীল ভুঁইয়া' উপন্যাসে নিজেদের সামন্ততান্ত্রিক প্রথার চিত্র অঙ্কন করেছিলেন বলা যায়। কেননা, এই দুটি উপন্যাসের সঙ্গে অমিয়ভূষণের পাকুড়িয়ার পিতৃভবন ও তাদের কার্যাবলীর সঙ্গে প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শৈশব থেকেই পাবনার বাইরে জীবন অতিবাহিত করলেও বাল্যের দেখা স্মৃতিগুলো কখনও মন থেকে মুছে যায়নি। অমিয়ভূষণ নিজেই বলেছেন যে, 'নীল ভুঁইয়া', 'রাজনগর' এবং 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাস কোন না কোন ভাবে তাদের পাকুড়িয়ার সেই বাড়িটার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছে। ঠাকুরদাদা, বাবা, মা, তাদের পোষাক, চালচলন, কথা বলার ভঙ্গি 'নীল ভুইয়া'র দেওয়ালে এঁকে ফেলেছেন। পাবনার নীলকুঠি ছিল শরিকের দাবি-পাল্টা দাবিতে যার ক্ষয়ে যাওয়া জরাজীর্ণ ভিত কাঁপছে এমন এক স্বল্পবিত্ত গেঁয়ো জোতদার গোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল। কিন্তু সেই শৈশবের দেখা নানা বিষয়গুলো লেখালেখির সময় তাঁর মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। 'নীল ভুঁইয়া' ও 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাস দুটি সম্পর্কে অমিয়ভূষণ লিখেছেন -

> "কথার ফাঁকে বলা যায় এটা আমার বেশ তৃপ্তি যে আমার 'নীল ভুঁইয়া' ও 'গড় শ্রীখণ্ড' বই দুটো আমার মা, বাবা ও মামাকে বেশ তৃপ্তি দিয়েছিল। আমার শ্বশুরমশায় বলেছিলেন, গড় শ্রীখণ্ড নীল ভুঁইয়ার চাইতেও সার্থক। এগুলোই আমার পুরস্কার।"[১১]

ছোটগল্পের হাত ধরে অমিয়ভূষণের সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল। 'প্রমীলার বিয়ে' নামক ছোটগল্পটি প্রথম পূর্বাশা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে ধীরে ধীরে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। চল্লিশের দশকের গোঁড়ার দিক থেকেই তিনি একাঙ্ক নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে উপন্যাস, নাটক ও প্রচুর প্রবন্ধও লিখেছিলেন। মোটামুটি ভাবে আমরা জানি যে, 'গড় শ্রীখণ্ড'ই অমিয়ভূষণের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটির জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজের আসন স্থায়ী করে নিয়েছিলেন। অমিয়ভূষণ তাঁর লেখায় রাজা, রানী, জমিদার, জোতদার, মধ্যবিত্ত, প্রলেতারিয়েত, লুম্পেন কারোর কথাই অবহেলা করেননি। গোটা সমাজের সকলের কথাই তিনি বলেছেন। এমনকি তাদের কথাও তিনি বলতে চেষ্টা করেছেন যারা ভাষার অভাবে নিজেদের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারছিল না। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যার কথাই তিনি লেখার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন -

> "আমি লোকের কথা বলতে চেয়েছি, অঞ্চলের কথা নয়। মানুষের কথা বলতে গেলে তাঁকে মাটিতে দাঁড় করাতে হয়, মাথার উপরে আকাশ দিতে হয়, আবহাওয়া, গাছ গাছরা দিতে হয়। এসব করতে নিজের চোখে দেখা মাটি, আকাশ, জল, গাছ আঁকা যত সহজ, অন্যের মুখে অপরিচিত সে সবের কথা শুনে সে-আঁকা ততটা ভালো হয় না। সেজন্য হয়তো পদ্মা থেকে শুরু করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই ভূ-ভাগ আমি বেশি এঁকেছি।"[১২]

২০০১ সালে ৮ ই জুলাই সকাল ১১ টা ৪০ মিনিটে কলকাতার 'বেলভিউ' নার্সিংহোমে এই সাহিত্যসাধকের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর লেখালেখির জগতে মোট ২৯টি উপন্যাস রচনা করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল - 'গড় শ্রীখন্ড,' 'নয়নতারা', 'দুখিয়ার কুঠি,' 'উদ্বাস্তু,' 'নির্বাস,' 'মধু সাধুখাঁ', 'রাজনগর', 'বিশ্ব মিত্তিরের

পৃথিবী', 'বিনদনি', 'হলং মানসাই উপকথা', 'মহিষকুড়ার উপকথা', 'চাঁদবেনে',। তিনি মোট ছয়টি ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থ রচনা করেন - 'পঞ্চকন্যা', 'দীপিতার ঘরে রাত্রি', 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'তন্ত্রসিদ্ধি', 'গল্প সমগ্র', 'ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য'। আবার 'প্রমীলার বিয়ে' লেখার মাধ্যমে ছোটগল্পের আসরে প্রবেশ করেন এবং একশোর বেশি ছোটগল্প রচনা করেন। তিনি মোট এগারোটি আত্মকথনমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন যার মধ্যে 'নিজের কথা', 'কেন লিখি', 'আমার সম্বন্ধে', 'খামখেয়ালি শহর', বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মোট চল্লিশটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন। যেমন – 'সাহিত্যিক জীবন মহাশয়', 'সাহিত্যের ধারণা', 'সাহিত্য প্রস্তাব', 'সংস্কৃতি বিষয়ক প্রস্তাব', বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার তিনি মোট সাতটি নাটক রচনা করেন। যেমন – 'মহাসত্ত্ব', 'রাঙাদি', 'বিয়োগ', 'প্রতিমা বাসবদত্তা', বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতা থেকে বহুদূরে উত্তর বাংলার নিবিড় শাল সেগুনের সান্নিধ্যে বসবাস করে এই সাহিত্যসাধক নিরলস প্রয়াসে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন। জীবন সন্ধানে আগ্রহী লেখকের সততা তাঁর সৃষ্টির ভুবনে পরিব্যাপ্ত। প্রচারবিমুখ এই বরেণ্য লেখক দীর্ঘকাল একনিষ্ঠতা ও মৌলিকতার স্বীকৃতি হিসাবে ত্রিবৃত্ত পুরস্কার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ পুরস্কার, বঙ্কিমস্মৃতি পুরস্কার, অকাদেমি পুরস্কার, শরৎ চ্যাটার্জী গোল্ড মেডালিস্ট পুরস্কার, কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরস্কার পেয়েছিলেন। আবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধি প্রদান করেছে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের সম্মান ও পুরুস্কারগুলোকে নিম্নে তালিকাবদ্ধ আকারে দেওয়া হল।

উত্তরবঙ্গের এই মহান সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার মহাশয় জীবিত অবস্থায় নিজেকে অনেকটা গোপনে রেখেই নিজের লেখালেখির কাজটি প্রতিনিয়ত করেছিলেন। 'পূর্বাশা' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর আত্ম-প্রচারের সুযোগ এলেও কলকাতার লেখকমন্ডলীর সঙ্গে তাঁর চিন্তা ভাবনায় বৈসাদৃশ্য চলে আসায় তিনি নিজেকে প্রচারের জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। তৎকালীন কলকাতার লেখক গোষ্ঠী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও তাঁর শিল্পীমন ও স্রষ্টার সৃষ্টি করা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেননি। ডাকবিভাগের কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি যা কিছু রচনা করেছেন তা আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এত বড় মাপের একজন লেখক, যাঁর লেখায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এযুগের ছাত্র সমাজের কাছে অমিয়ভূষণ মজুমদার যেন একজন অপরিচিত লেখক। বর্তমানে উত্তরবঙ্গে যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, প্রায় সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অমিয়ভূষণ মজুমদারের কথাসাহিত্য, বিশেষ করে 'গড় শ্রীখন্ড' এর মত মহাকাব্যিক উপন্যাসকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সর্বভারতীয় 'নেট' পরীক্ষা এবং পশ্চিমবঙ্গের 'সেট' পরীক্ষার বাংলা সিলেবাসে অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস' উপন্যাসটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতে উভয়বঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদারকে সাদরে গ্রহণ করা হবে। সৃষ্টিকর্মের জন্য তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান তিনি পাবেন। তাঁর 'রাজনগরে' তিনিই রাজা হয়ে বিরাজ করবেন।

Reference:

১. 'নিজের কথা', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১, পৃ. ৯
২. 'প্রথম পরিচ্ছেদ', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ২, পৃ. ১২
৩. 'আমার বাল্যের দুর্গোৎসব', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৯, পৃ. ৯
৪. 'খাম খেয়ালি শহর', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৭, পৃ. ৯
৫. 'নিজের কথা', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১, পৃ. ১২
৬. তদেব, পৃ. ১৩
৭. তদেব, পৃ. ১৫
৮. 'কেন লিখি' অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৩, পৃ. ৯
৯. 'আমার সম্বন্ধে' অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৪, পৃ. ১৫
১০. তদেব, পৃ. ১৬
১১. 'নিজের কথা', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১, পৃ. ১০
১২. 'লিটল ম্যাগাজিন ও আমি' অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৬, পৃ. ১৪

Bibliography:

মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১
মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র ২, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩
মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র ৯, দে'জ পাবলিশিং, জানু ২০১০
মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র ৭, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৯
মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১
মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র ৩, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১১
মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র ৪, দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০০৭
মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১
মজুমদার, অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র ৬, দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০০৮
নাগ, রমাপ্রসাদ, স্বতন্ত্র নির্মিতি ও অমিয়ভূষণ সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ২০০২
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পুস্তক বিপণি, ১৯৩৮